International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-X, Issue-I, January 2024, Page No.13-24
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v10.i1.2024.13-24

একদিন অচানক: মৃণাল সেনের চলচ্চিত্রে আখ্যানের পুনর্নির্মাণ

মোস্তাক আলি

সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কালীগঞ্জ গভর্নমেন্ট কলেজ, দেবগ্রাম, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract:

Mrinal sen is a legend and a pioneer of a parallel cinema in India.His most of the films rejected the conventional narrative style and created a new cinematic language through the novelty of the story format and stylistic experiments.Instead of the traditional tradition of chubby storytelling with beginning-middle-end, he created another aesthetic form in contrast to modernity and conventional aesthetics in the film industry.It is true,that,the trend of conventional storytelling seen in contemporary and subsequent directors, he deviated from that tradition. So it is seen that the story does not follow a fixed pattern, but an unexpected sudden jolt changes the direction of the story. Many times, additional fragmented parts of the main story help to move the story forward and the time, history and society as well as the surroundings appear like a flash of light in the middle of the story.He never wanted the audience to be engrossed by the story and therefore he carefully avoided the density or attraction of events. 'Ekdin Achanak' (1989) based on Ramapad Chowdhury's novel 'Beej'. In the first scene, the use of freeze shots and some black-and-white snapshots and the sound track of incessant rain have created the image and atmosphere of a flooded Kolkata under the shelter of an extraordinary montage. One rainy evening, Professor Shashank Babu left home and the rest of the family members became depressed and various fragmented memories have been presented in an extraordinary collage manner under the shelter of flashbacks. Here, the continuity of the narrative has not been preserved according to the conventional style of storytelling.For the narration of this past and present story, he did not stop the present and enter the past and narrate the story of the present according to the conventional method.With the help of editing, while talking about the present, he has shown the image of the past through multiple flashbacks, that is, the past and the present are going hand in hand.And thus he reconstructs the narrative.

Keywords: Pioneer, parallel cinema, Stylistic experiments, New aesthetic, Reconstruction.

বাংলা তথা ভারতীয় চলচ্চিত্রের এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক মৃণাল সেন। ভারতীয় চলচ্চিত্রের ব্যতিক্রমী এই পরিচালক প্রচলিত আখ্যান বর্ণনার রীতিকে পুরোপুরি অস্বীকার করে চলচ্চিত্রে কাহিনি বিন্যাসের অভিনবত্ব

তথা আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে নতুন সিনেমা ভাষার সৃষ্টি করেন।এর ফলে তাঁর নির্মিত চলচ্চিত্রে আদি-মধ্য-অন্ত্য সমন্বিত নিটোল কাহিনি বর্ণনার চিরাচরিত প্রথার পরিবর্তে কাঠামোগত অর্থাৎ আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা, বাচনভঙ্গি, বিষয় নির্বাচন ও তাত্ত্বিক পরিবর্তনের মাধ্যমে চলচ্চিত্র-শিল্পে আধুনিকতা তথা প্রচলিত নান্দনিকতার বিপরীতে অন্য এক নান্দনিকতার সৃষ্টি হয়।এটা সত্য যে, সমকালীন ও উত্তরসূরী পরিচালকদের মধ্যে গতানুগতিক কাহিনি বর্ণনার যে ঝোঁক লক্ষ্য করা যায়, তিনি সেই সনাতন রীতির আদল থেকে সরে এসেছিলেন। তাই সেখানে দেখা যায় কাহিনি নির্দিষ্ট প্যাটার্ন ধরে এগিয়ে চলে না, কিছুদূর অগ্রসর হয়েই অপ্রত্যাশিত এক তীব্র ঝাঁকুনি কাহিনির অভিমুখ পালটে দেয়।অনেক সময় মূল কাহিনির অতিরিক্ত ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন খন্ড খন্ড একাধিক ভাবনা কাহিনিকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে এবং কাহিনি বর্ণনার মাঝে হঠাৎ আলোর ঝলকানির মতো উঠে আসে সময়,ইতিহাস ও সমাজ তথা পারিপার্শ্বিকতা।তিনি কখনই চাইতেন না কাহিনির দ্বারা দর্শক আচ্ছন্ন হোক আর তাই ঘটনার ঘনঘটা বা আকর্ষণকে তিনি সযত্নে পরিত্যাগ করেছেন।জীবন সত্যের অন্বেষণে আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে আখ্যান বর্ণনায় যে বৈচিত্র্য নিয়ে এসেছিলেন, সব ক্ষেত্রে তিনি সফল না হলেও তিনি কিন্তু অভীষ্ট লক্ষ্য থেকে সরে আসেননি।বরং আবার নতুন উদ্যমে নেমে পড়েছেন। দৃপ্ত কণ্ঠে তিনি জানিয়েছিলেন,"ছবিতে গল্প বলা সম্ভব এবং গল্পই বলা হয়েছে এতকাল এবং বলা হবেও। এবং খুব অসাধারণ ছবি করা যাবে, করা গেছেও এবং যাচ্ছে,গল্প মারফত অর্থাৎ ন্যারেটিভ-এর মাধ্যমে।কিন্তু ছবিতে কি শুধু ন্যারেটিভ-ই থাকবে? এটা মানতে আমি রাজি নই। ছবি ন্যারেটিভ ছাড়াও অন্যকিছু হতে পারে।ছবি একটি খবরের কাগজের সম্পাদকীয় নিয়েও হতে পারে।কথা হচ্ছে,আমাকে একটা বক্তব্য বলতে হবে এবং আমি ছবি এবং শব্দ মারফত এ দুটিকে মিশিয়ে জড়িয়ে,এ দুটোর ভেতর গোলমাল বাধিয়ে একটা আপাত কনফ্লিক্ট এনে,অথবা তাদের মিলিয়ে যা খুশি তাই করতে পারি।"[১] সাহিত্যাশ্রিত চলচ্চিত্র নির্মাণকালে আঙ্গিকগত পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে প্রথাগত গল্প বলার রীতিকে প্রত্যাখ্যান করে আখ্যান বর্ণনায় অভিনবত্ব সঞ্চারে তিনি নির্দ্বিধায় ত্রিবিধ আনুগত্যের কথা স্বীকার করেছিলেন– লেখকের মূল ভাবনার প্রতি আনুগত্য,চলচ্চিত্র নামক শিল্প-মাধ্যমের প্রতি আনুগত্য ও বর্তমান সময়ের প্রতি আনুগত্য।এই ত্রিবিধ আনুগত্যের দায় থেকেই সাহিত্যের হুবহু অনুকরণ বা অনুসরণ নয়,অনুসৃত কাহিনিকে চলচ্চিত্র নামক নতুন শিল্পমাধ্যমে নতুন সময়ের প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছেন।তাই দেখা যায়,তাঁর চলচ্চিত্রে কাহিনির ভূমিকা প্রান্তিক, গৌণ।সাহিত্যাশ্রিত হয়েও তা যেন সাহিত্যনিরপেক্ষ।তাঁর "ছবিগুলি কাহিনীনির্ভর হয়েও হয়ে ওঠে না গতানুগতিক কাহিনীচিত্র। ...কাহিনী তাঁর ছবিতে কেবল উপলক্ষ।তাঁর ব্যবহৃত চরিত্রগুলিকে ধারণ করার আধার মাত্র।"[২]

১৯৬৮ সালে প্রকাশিত 'ভারতীয় নিউ সিনেমা আন্দোলনের ইশতেহার'-এ মৃণাল সেন বলেছিলেন–"এই সময়ে ভারতীয় তথা হিন্দি ছবি একপ্রকার গভীর সঙ্কটের মধ্যে দিয়ে চলছে। ছবি তৈরির আকাশছোঁয়া খরচ,তারকাদের মাত্রাতিরিক্ত পারিশ্রমিক,আর্থিক সংস্থাগুলির চক্রবৃদ্ধি হারে বেড়ে চলা সুদের মাত্রা,ছবির জগৎ জুড়ে সর্বত্র 'কালো টাকা'র লেনদেনের প্রাচুর্য ইত্যাদির সাথে চলচ্চিত্রের মত সৃষ্টিশীল মাধ্যমে শৈল্পিক ভাবনাচিন্তা ও কল্পনার দীনতা এবং অপ্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুর আধিক্য আদতে ভারতীয় সিনেমা জগৎকে একটা দুঃখজনক সঙ্কটের সামনে এনে দাঁড় করিয়েছে।পরিচালক, লেখক ও ছবির সাথে যুক্ত প্রায় সকলে নতুন উদ্ভাবন সম্বন্ধে ভাবনাচিন্তা করা একদম বন্ধ করে দিয়েছেন। কেবলমাত্র ব্যবসায়িক সাফল্যের জন্য তাঁরা ছবিতে জনপ্রিয় তারকাদের ব্যবহার করছেন, গড়ে তুলছেন নিরর্থক জগাখিচুড়ি

সেট।ছবিতে অর্থহীন ও কুরুচিকর জমকালো বাহ্যিক উপাদানে ভরপুর সিকোয়েন্স তৈরি করে মানুষকে মোহগ্রস্ত করে রাখার চেষ্টা করছেন। ছবিকে নান্দনিক ও সৃজনশীল কাজ হিসেবে কেউ বিবেচনা করছেন না।এই সাংঘাতিক নিয়ন্ত্রক শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে যিনি শৈল্পিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা নিয়ে ছবি তৈরি করছেন,তিনি সেই ছবি দর্শকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য উপযুক্ত মাধ্যম খুঁজে পাচ্ছেন না। ফলে তা অচিরেই হারিয়ে যাচ্ছে গভীর অন্ধকারে। সুতরাং সার্বিক চিত্রটা এই রকম যে, যিনি গতানুগতিক মূল ধারার ছবি থেকে বেরিয়ে এসে ভিন্ন আঙ্গিকের ছবি করবেন তাঁকে সমমনোভাবাপন্ন প্রযোজক খুঁজতে হবে, সেই ছবি বৃহৎ সংখ্যক দর্শকের কাছে পৌঁছে দিতে বড় পরিবেশকের সাহায্য নিতে হবে এবং সবশেষে প্রেক্ষাগৃহ ভাড়া করে সেখানে ছবির প্রদর্শন করতে হবে। কিন্তু এই অক্লান্ত পরিশ্রমের পরেও এটা অনিশ্চিত যে ব্যাপক সংখ্যক মানুষ প্রেক্ষাগৃহে এসে ছবিটি দেখবেন।এই প্রকার অসংখ্য ভিন্ন আঙ্গিকের ছবি দর্শকহীন প্রেক্ষাগৃহে প্রতিদিন প্রদর্শিত হয় সারা দেশ জুড়ে। এইভাবে চিন্তাশীল চলচ্চিত্রকারেরা তাঁর শিল্পে স্বীকৃতি থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন প্রতি মুহূর্তে। এটা বলার অপেক্ষা রাখেনা যে,এই প্রকার ছবির দর্শক সংখ্যা খুব সীমিত।এর কারণ,আমাদের ছবির জগৎ,আর্থিক মুনাফা বৃদ্ধির কুৎসিত চক্রান্তের বাস্তবায়নের জন্য বিগত কয়েক দশক ধরে বিনোদনের নোংরা একটি ধারণার জন্ম দিয়েছে এবং সেইমতে ব্যাপক অংশের দর্শকের বিনোদন সর্ম্পকের ধারণার আমূল পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছে।বেশি সংখ্যক ছবি প্রস্তুতকারী দেশগুলিতে অসংখ্য পরিচালক ভাল ছবি তৈরির জন্য লড়াই করছেন।বাণিজ্যিক ছবিতে স্থূল,অমার্জিত বিষয়বস্তুর সংযোজনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন। সিনেমাকে কেন্দ্র করে নতুন প্রকার এই আন্দোলন ফ্রান্সে 'নিউ ওয়েভ', আমেরিকায় 'আন্ডারগ্রাউন্ড সিনেমা' এবং অন্যান্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার নামে পরিচিত হয়েছে।বর্তমান ভারতবর্ষে দাঁড়িয়ে সময় ও পরিস্থিতির দাবি এটাই যে, আমাদের দেশে এই প্রকার আন্দোলন সংগঠিত করতে হবে অতি সত্বর।"[৩] তাঁর এই প্রস্তাবিত প্রত্যয়ী ভাবনার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায় অধিকাংশ চলচ্চিত্রগুলিতে।যদিও তাঁর প্রথম দিককার চলচ্চিত্রে রক্ষণশীলতা আমাদের দৃষ্টি এড়ায় না।

রমাপদ চৌধুরীর 'বীজ' উপন্যাস শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত হয়।গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন 'নতশির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে'। 'মিশ্র তরঙ্গ' রীতির এই উপন্যাসে লেখক অস্থির সাতের দশকের 'ঘূর্ণিপাকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত' ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থায় এক চিরন্তন সত্যের উন্মোচন করেছেন। সর্বগ্রাসী ভোগবাদী মানসিকতায় আচ্ছন্ন সুগভীর পঙ্কিলতায় নিমজ্জিত সমাজব্যবস্থায় সবকিছুকেই লাভ-লোকসানের তুলাদন্ডে পরিমাপ করা হয়। আদর্শ,নীতি-নৈতিকতা, অকৃত্রিম নির্মোহ সাধনাকে প্রতি মুহূর্তে ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করা হয়। মূল্যবোধের অবক্ষয়ে বার বার স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয় পুথি-পত্র ঘেঁটে, সত্যের পথে চলে কি লাভ! জীবনের চলার পথে এই সব আদর্শবোধ নিতান্তই বেমানান, হাস্যকর। কিন্তু সময়ের চক্রে বিলীয়মান এই মূল্যবোধহীনতা জীবনের সারসত্য হতে পারে না। লেখক সহৃদয়তার সঙ্গে আমাদের সেই অমোঘ মন্ত্র শিখিয়েছেন– সত্য, শেকড়, বীজের অন্বেষণ ছাড়া আমাদের সামনে অন্য কোনও পথ খোলা নেই। উপন্যাসের বিস্তৃত পটে এই চিরন্তন সত্যই ব্যঞ্জিত হয়েছে।সিন্ধুসভ্যতার প্রাচীন শিলালিপির অর্থ উদ্ধার তথা দেশের সভ্যতা, ঐতিহ্য, শেকড়ের অন্বেষণে ব্যাপৃত অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর নিষ্ঠুর সময়ের কঠোর বাস্তবতায়, মেকী-চাকচিক্যময় আধুনিকতার প্রলেপ দেওয়া সমাজের ফাঁপা অথচ জোরালো দাবীর নিষ্ঠুর সত্য তথা রূঢ় সমাজবাস্তবতার কাছে হার মানেন।তার ফলে পরিবার, সমাজ– সবদিক থেকেই তিনি বিচ্ছিন্ন,একাকী হয়ে পড়েন। প্রতিমুহূর্তেই যেন তার মাথার মধ্যে জীবনানন্দের কবিতার সেই অমোঘ প্রশ্ন ঘুরপাক খায়– "সকল লোকের মাঝে ব'সে/আমার নিজের

মুদ্রাদোষে/আমি একা হতেছি আলাদা?/আমার চোখেই শুধু ধাঁধাঁ?/আমার পথেই শুধু বাধা?"[৪] তাই, দীর্ঘদিনের হতাশা,অবসাদ,কিছু করতে না পারার যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত মনের পুঞ্জিত অভিমান,অভিযোগ হঠাৎ-ই জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মতো ফেটে পড়ে। আপন ভালোবাসা, আদর্শ, সাধনা, পারিবারিক মায়ার বন্ধন— সমস্ত কিছুকে ত্যাগ করে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান।আর ফিরে আসেননি।কিন্তু সাময়িক, বানানো মিথ্যের কাছে চিরন্তন সত্যের কখনও পরাজয় হয় না। তাই কাহিনীর পরিসমাপ্তিতে বিশ্বাসের রোশনাই-এ সানাইয়ের সুরে বৃষ্টির জলসিঞ্চনে রোপিত বীজের অঙ্কুরণের আশাতে সূচিত হয়েছে প্রভাতের নবসূর্যোদয়। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য 'আগামী' কবিতায় লিখেছিলেন–

"জড় নই,মৃত নই,নই অন্ধকারের খনিজ,
আমি তো জীবন্ত প্রাণ,আমি এক অঙ্কুরিত বীজ;
মাটিতে লালিত,ভীরু,শুধু আজ আকাশের ডাকে
মেলেছি সন্দিগ্ধ চোখ,স্বপ্ন ঘিরে রয়েছে আমাকে।"[৫]

একটি বীজের মধ্যে ভবিষ্যতের সম্ভাবনা লুকিয়ে থাকে। উপযুক্ত সার, জল, মাটি, আলো পেলে তা অঙ্কুরিত, পল্লবিত হয়ে ক্রমশ মহীরুহে পরিণত হয়। কিন্তু মানুষ যদি তার প্রকৃত মূল্য না বোঝে তাহলে একদিন তা পচে, শুকিয়ে নষ্ট হয়ে যায়। প্রতীকধর্মী এই উপন্যাসে লেখক দেখিয়েছেন শশাঙ্কশেখরের মতো মানুষেরাই আমাদের দেশ, সভ্যতা তথা সংস্কৃতির বীজ।আমাদের স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ।

বে-সরকারী কলেজের ইতিহাসের অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর নিষ্ঠুর সময়ের স্রোতের প্রতিকূলে প্রাচীন শিলালিপি নিয়ে গবেষণা করেন। তিনি বিশ্বাস করেন,"অতীতকে জানার আরেক নাম পিতৃপরিচয়।"[৬] যা আধুনিক নাগরিক যান্ত্রিক যাপনে অভ্যস্ত পরিবারের স্ট্যাটাস-পাগল ছেলেমেয়ে ও স্ত্রী তথা সমাজের কাছে মূল্যহীন। আত্মপরিচয়ের অন্বেষণে আত্মত্যাগী কঠোর সাধনা কোনো মূল্য পায় না, তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বার বার মনে করিয়ে দেওয়া হয় এসব জীবনের কোনও কাজে আসে না। সেই পরিহাস,তাচ্ছিল্যে তিনি বিষাদাক্রান্ত হলেও এড়িয়ে চলতেন, "সে-সব দিনে তাঁর মন পড়ে থাকে কোন গভীর অন্বেষণের মধ্যে...।"[৭] অন্য ঐতিহাসিকের গ্রন্থের ফুটনোটের স্বীকৃতিতে শশাঙ্কশেখরবাবু আনন্দিত হলেও পরিবারের অন্যান্য সদস্যরা তাতে খুশি হতে পারে না, বরং বাজার চলতি নোট বই-এর লেখক সহকর্মী অমিতেশবাবু তাদের কাছে অনেক বেশি দামী,একজন গণ্য ব্যাক্তি– "মা একদিন অভিমান করে বলেছিল, শুধু কতগুলো ভুয়ো আদর্শ নিয়ে মানুষ বাঁচতে পারে না। অমিতেশবাবু তো দিব্বি গুছিয়ে নিচ্ছেন, ওঁর মত নোটবই লিখলেও তো পারো।"[৮] তাই, 'সকল লোকের মাঝে বসে' এক নির্জন দ্বীপের বাসিন্দা অর্থহীন একাকীত্বের অভিমানে একদিন হঠাৎ স্ত্রী সুধাময়ীর কাছে থেকে এক টাকা নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে যান।যদিও তিনি একঘন্টা পরে ফিরে আসবেন বলেছিলেন। কিন্তু আর ফেরেননি। শুরু হয় পরিবারের সদস্যদের অন্বেষণ, প্রতীক্ষা, উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা ও আত্মবিশ্লেষণের পালা। যদিও তারা এতদিন তাঁর প্রতি একধরনের উপহাস, ব্যঙ্গ করে গেছে,"আমাদের পরিবারের মধ্যেও তো আমরা তোমাকে শুধু একটা ফুটনোট করে রেখে দিয়েছিলাম। এই সমাজের কাছেও তুমি তাই ছিলে।"[৯] পরিবারের সদস্যদের আচার-ব্যবহারে তিনি বিরক্ত হলেও তিনি কোনোদিন প্রতিবাদ করেননি,মানিয়ে নেবার চেষ্টা করেছেন। খেয়ালী স্বভাবের জন্য তাঁকে মাঝে মাঝে স্ত্রী ও সন্তানদের বক্রোক্তি শুনতে হত, কিন্তু তিনি তা নিয়ে মাথা ঘামাতেন না। ভাড়াটে বাড়ির নিজস্ব ঘরের ধুলোটে লোহার র‍্যাকের বিবর্ণ মূল্যবান বইয়ের রাজ্যে সত্যের অন্বেষণে নিমগ্ন থাকতেন।

কিন্তু বইগুলোকে তিনি যতই মূল্যবান মনে করুন,অন্যদের কাছে তা মূল্যহীন। হয়তো বেমানান।তাই মেকী আধুনিকতার চাকচিক্যে লোহার র‍্যাকের পরিবর্তে নতুন কাঠের বুক-শেলফ আধুনিকতার দাবী করে। মাঝে মাঝে তিনি উপলব্ধি করেন আটচল্লিশ বছর বয়সেই আটান্নর প্রবীণত্ব অর্জন করতে গিয়ে তিনি অনেক কিছুই হারিয়েছেন। কিন্তু কি হারিয়েছেন বুঝতে পারেন না।শশাঙ্কশেখরের অন্তর্ধানের পর ‘‘সমস্ত বাড়ির চেহারাটা যেন মুহূর্তে বদলে গেল। চারখানা মুখ, সুধাময়ী, অমু, ঝুমা, রুমা– সবাই পরস্পরের মুখের দিকে তাকালো। সবারই মুখে আতঙ্কের ছায়া, আতঙ্কের আড়ালে যেন চাপা কান্না টলটল করছে।’’[১০] পুত্র অমু বাবার অন্বেষণে সহকর্মী অমিতেশবাবুর কাছে বাবার কোনও খোঁজ না পেয়ে বাড়ির মালিক যতীনবাবুর সঙ্গে হাসপাতাল, মর্গে যায় এবং বাবার সন্ধান না পেয়ে ফিরে আসে। শেষে সুধাময়ীর বোন স্বর্ণকে খবর দেওয়া হয়।স্বর্ণর স্বামী রেবতী বড় কোম্পানির উচ্চপদস্থ অফিসার। তিনি পরিচিত পুলিশ বন্ধু ডি সি সাউথকে খবর দেন। কিন্তু কোথাও শশাঙ্কশেখরের খোঁজ পাওয়া যায় না। এছাড়া ঝুমার অফিসের সহকর্মী অলোকবাবুর পরামর্শে সুধাময়ী ‘বুড়োবাবা’ তান্ত্রিকের কাছে যান।কাপালিক প্রথমে আশার বাণী না শোনালেও পরে আশ্বাস দেয় ফিরে আসবে। পাশাপাশি একটা বিদঘুটে কুৎসিত ভাবনা তথা সন্দেহের বাতাবরণ তৈরি হয়।স্ত্রী সুধাময়ীর সঙ্গে কোনো মনোমালিন্য হয় নি তো! কোনও দাম্পত্য কলহে স্বামী তাকে পরিত্যাগ করে যান নি তো! সন্দেহের বাতাস শুধু বাইরে ঘোরাফেরা করেনি,ঘরের চার দেওয়াল ভেদ করে তা ক্রমশ সুধাময়ীকেও গ্রাস করে। স্ত্রী সুধাময়ীও স্বামীকে একপ্রকার সন্দেহ করেন। এই সন্দেহের নিরসনে নিজেকে বাঁচাতে স্বামীর একান্ত সাধনার ঘরে গেলে একটুকরো কাগজে তিনবার অপর্ণার নাম লেখা দেখতে পান। কিন্তু ছেলে-মেয়েদের জানাতে পারেন না। গোপন রাখেন। ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে পড়লে নিজেই অপর্ণার সন্ধানে তার বাড়িতে যান এবং সাক্ষাৎ না পেয়ে ফিরে আসেন। যদিও অপর্ণা একসময় নিজেই আসে এবং স্যারের সঙ্গে দীর্ঘদিন যোগাযোগ না করার কারণ ব্যক্ত করে।মনের মধ্যে যে চাপা কষ্ট,প্রচ্ছন্ন সন্দেহ ধূমায়িত হচ্ছিল সুধাময়ী তা থেকে যেন রেহাই পান। শশাঙ্কশেখরবাবু যেমন সকলের মাঝে থেকেও নিঃসঙ্গ, একা হয়ে পড়েছিলেন তেমনি পরিবারের অন্যদেরও শশাঙ্কবাবুর প্রতি তীব্র অভিযোগ ছিল। চাকুরীরতা ঝুমা ও কলেজে পাঠরতা রুমা– দুই সোমত্ত মেয়ে মনে করে বাবার একপ্রকার উদ্যোগহীনতা, উদাসীনতার জন্যই তাদের বিয়ে হয় নি। একজন মেধাবী আদর্শবান অধ্যাপকের পুত্র অমু পড়াশোনায় তেমন ভালো ছিল না। শশাঙ্কবাবু এটা মানতে না পেরে মনে মনে দগ্ধ হতেন।অমু সামান্য পুঁজির বিনিয়োগে তেমন ব্যবসায়িক সাফল্য অর্জন করতে পারেনি।একজন অধ্যাপকের ছেলে হয়ে বাবার কাছে থেকে আরও কিছু প্রত্যাশা করেছিল।শশাঙ্কশেখর লক্ষ্য করেছেন,“ওরাও আর আগেকার মত কাছে আসে না। এড়িয়ে এড়িয়ে যায়।”[১১] শশাঙ্কশেখর বাড়ি থেকে বেরিয়ে গিয়ে নীরব প্রতিবাদের যে মশাল জ্বালান, স্ত্রী ছেলে মেয়ে প্রত্যেকেই যেন সেই আগুনে ভিতরে ভিতরে দগ্ধ হতে থাকে। এতদিন যে শশাঙ্কশেখরকে অবিবেচক, আত্মসুখকামী, বিলাসীরূপে দেখেছে, প্রতিনিয়ত বিদ্রুপের তীব্র কশাঘাতে জর্জরিত করেছে,তাঁর অনুপস্থিতিতে অতীতের স্মৃতিচারণে তাঁরই আদর্শের আয়নায় নিজেদের আত্মপরিচয় খুঁজে পায়।অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে শশাঙ্কবাবুর আদর্শকে বাঁচিয়ে রাখে “আছে, কোথাও আছে, একদিন ফিরে আসবে, এই বিশ্বাস”-এ।[১২]

লেখকের বহুদর্শী সুগভীর সমাজবীক্ষায় আমাদের ফেলে আসা সমাজ, সমাজের অবক্ষয়,মূল্যবোধহীনতা ও সভ্যতার অবলুপ্তির সকরুণ আলেখ্য চিত্রিত হয়েছে।‘সর্বাতিশায়ী ভোগবাদে আচ্ছন্ন’ সমাজের কাছে সভ্যতার বাইরের রূপটাই বড় হয়ে উঠেছিল। সভ্যতার মূল শক্তিটা কোথায় সভ্য সমাজ কোনও দিন

জানতে চায়নি।সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারার প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়,আমরা আমাদের সত্তা-শেকড়কে ভুলে সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে পারস্পরিক প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে অনেককিছু ধ্বংস করে ডেভেলপমেন্টের জয়মালা পরে তরতর করে এগিয়ে চলছি। কিন্তু সত্যি কী এগোতে পারছি? হয়তো এক পা এগোতে গিয়ে দু'পা পিছিয়ে যাচ্ছি।সমাজের দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে ঠিকই কিন্তু আমাদের মোরাল ভ্যালুজ দিন দিন অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। তাই, "আমাদের বর্তমান সভ্যতা একটা চলন্ত ঘড়ির মত,টিকটিক করে চলছে,তার বড় কাঁটাটা দ্রুত এক একটা ঘর পার হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সেই ঘড়িটার ছোট কাঁটাটাই নেই।ফলে ঘড়িটাই অর্থহীন হয়ে গেছে।"[১৩] আসলে এই সভ্যতার নোঙরটাই ছিঁড়ে গেছে।একজন সাধারণ চাষী জানে 'বীজধান' তার কাছে সবচেয়ে দামী, মূল্যবান। তাই বীজতলাকে সে প্রাণপণে বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা করে।আমরা,আমাদের এই বর্তমান সভ্যতার ধ্বজাধারীরা সেই বীজ বা শেকড় চিনিনা বা কোথায় আছে জানার চেষ্টাও করিনা। কোনও একটি সভ্যতার শিকড় হারিয়ে গেলে বা খোঁজ পাওয়া না গেলে তার পতন অনিবার্য,অবিশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে।ক্ষয়িষ্ণু এই সমাজে একশ্রেণির মানুষ আইডেন্টিটি তৈরির নেশায় সচেতনভাবে নীতি-নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে প্রতিনিয়ত ছুটে চলেছে এবং ছুটতে ছুটতে আসলে নিজেদের আইডেন্টিটিকেই হারিয়ে ফেলছে। কম সময়ে কীভাবে অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌছানো যায়,জীবনে সাফল্য অর্জন করা যায় প্রত্যেকে সেই চিন্তার রত।কারণ এ সমাজে সাফল্যের দাম আছে,সাধনার কোন দাম নেই।সমাজের চোখে কোনও ব্যক্তির সফলতার প্রধান মানদণ্ড অর্থ,বিলাস,বৈভব,স্ট্যাটাস।। তাই বড় কোম্পানির উচ্চপদস্থ অফিসার, সাজানো-গোছানো বিশাল লাক্সারি ফ্ল্যাটের মালিক রেবতী,বাজার চলতি নোট বই-এর লেখক অমিতেশবাবু সমাজের পূজনীয় ব্যক্তি বলে পরিগণিত হয়।সিনেমার হিরোদের একঝলক দেখার জন্য সকলে ছুটে যায় অথচ প্রকৃত জ্ঞানী মানুষকে কেউ মূল্য দেয় না।সভ্যতার হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের জন্য বা জাতির আত্মপরিচয়ের সন্ধানে স্রোতের প্রতিকূলে আপোশহীন কৃচ্ছ্রসাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করে শশাঙ্কবাবু যে মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন,তিনি জানতেন এই ক্ষুদ্র অনিশ্চিত জীবনে তা কোনোমতেই সম্ভব নয়। তরুণ প্রজন্মের হাতে তুলে দিতে চেয়েছিলেন ভবিষ্যতের ভার।যে প্রজন্ম অন্ধকারের বুক বিদির্ণ করে এগিয়ে যাবে আগামীর দিকে।

রমাপদ চৌধুরীর উক্ত উপন্যাস অবলম্বনে মৃণাল সেন হিন্দি ভাষায় 'একদিন অচানক'(১৯৮৯) চলচ্চিত্র নির্মাণ করেন। ক্ষয়িষ্ণু সমাজব্যবস্থায় কিছু করতে না পারার যন্ত্রনায় দগ্ধ,ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ে স্ত্রী সুধাময়ীকে "বিছানায় ছটফট করতে করতে দীর্ঘশ্বাস ফেলে শশাঙ্কশেখর বলেছিলেন, সবচেয়ে বড় দুঃখ কি জানো, মানুষের শুধু একটাই জীবন।

সুধাময়ী সেদিন একটা কথাও বলতে পারেন নি। শুধু নিঃশব্দে শশাঙ্কশেখরের বুকের ওপর হাতখানা রেখেছিলেন।

শুধু একটাই জীবন! কি বলতে চেয়েছিলেন শশাঙ্কশেখর? একটা জীবন দিয়ে জীবনের সব দায়িত্ব পালন করা যায় না, সে-কথাই!"[১৪] উপন্যাসে বর্ণিত এই আখ্যানাংশের দ্বারা পরিচালক প্রভাবিত হয়েছিলেন।মৃণাল সেন বলেছেন, "Reading the text, I was jolted out of my seat when,not exactly in a similar set-up, I bumped into the line, The Tragedy is that man has only one life,that he lives just once."[১৫] ঔপন্যাসিক বিগত শতাব্দীর সাতের দশকের অস্থিরতার প্রেক্ষাপটে ক্ষয়িষ্ণু সমাজ-জীবনের যে সকরুণ মূল্যবান দলিল তুলে ধরেছিলেন তার এক দশক পরে পরিচালক মৃণাল

সেন এই চলচ্চিত্রে সেই ভঙ্গুর সমাজের নৈরাশ্য,সংশয়,বিচ্ছিন্নতায় ক্ষত-বিক্ষত মানবমনের অন্তরীণ জগতের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরলেন। প্রফেসর শশাঙ্কশেখর নিরুদ্দেশ হওয়ার পর তার অদর্শনে চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াগুলো লেখক তুলে ধরেছিলেন।আলোচ্য চলচ্চিত্রেও দেখা যায় শশাঙ্কবাবুর অনুপস্থিতি পরিবারের সদস্যদের উপর কী প্রভাব ফেলে তার দলিল উত্থাপন করেছেন মৃণাল সেন।এক বৃষ্টিভেজা সন্ধ্যায় অবসরপ্রাপ্ত ইতিহাসের অধ্যাপক শশাঙ্কশেখর কাউকে কিছু না বলেই ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান।ফিরে আসবেন বলেছিলেন কিন্তু আর আসেননি। পরিবারের উপর নেমে আসে এক সুগভীর শূন্যতা।কিন্তু একদিন না একদিন ঠিক ফিরে আসবেন— এই প্রত্যয় ও বিশ্বাসে এক অনন্ত প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে বসে থাকে সকলে।এই প্রতীক্ষা ক্রমে অভিমান,অভিযোগ,উদ্বেগ,উৎকণ্ঠায় পরিণত হয়।অপ্রত্যাশিত এই ঘটনায় প্রায় সকলেই তাঁর প্রতি তীব্র আক্রোশে ফেটে পড়ে,জীবনের পাওয়া ও না-পাওয়ার হিসেবের খাতা খুলে বসে— এমনটা করা উচিত হয়নি,সারাজীবন স্বার্থপরের মতো শুধুই নিজের কথায় ভেবেছেন,যাওয়ার আগে ব্যাংকের টাকা তুলে দিয়ে যাননি বা তার অনুপস্থিতিতে পরিবারের অন্য কেউ তুলতে পারে সেই ব্যবস্থাও করে যাননি ইত্যাদি।দীর্ঘ এক বছরের ব্যর্থ অন্বেষণ ও প্রতীক্ষার পর কেমন যেন সব কিছু শান্ত হয়ে যায়,সকলেই যেন নিজেদের ভুল বুঝে অনুশোচনায় দগ্ধ হতে থাকে।শেষ দৃশ্যে অতীত জীবনের পর্যালোচনায় পরিবারের চার সদস্য— স্ত্রী সুধা,পুত্র অমু,দুই মেয়ে নীতা ও সীমা প্রত্যেকেই প্রাণহীন শূন্য ঘরে বিচারালয়ে বন্দী আসামীর মতো যেন বিচারকের কাছে নিজেদের জবানবন্দি দিতে থাকে।আর সেই জবানবন্দির মাঝেই বেরিয়ে আসে তার নিরুদ্দেশ হওয়ার সম্ভাব্য কারণ।বড় মেয়ে নীতা জানায়,আমার মনে হয় বাবা চার-পাঁচজন সাধারণ মানুষের মতোই ছিলেন।বাবাও সেটা হয়তো উপলব্ধি করেছিলেন। আর সেইজন্যেই হয়তো তিনি তাদের ছেড়ে চলে গেছেন।তিনি জীবনে হয়তো অনেক কিছুই চেয়েছিলেন,করে উঠতে পারেননি।এই অপ্রাপ্তি ও অসাফল্যের জন্যে যে চাপা কষ্ট সর্বদা কুরে কুরে খেত,তার ফলে পরিবার,সমাজ সব দিক থেকেই তিনি বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন।কাকে অবলম্বন করে তিনি সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন সেই পথের দিশা তিনি হয়তো খুঁজে পাননি। জীবনের এই দুঃসহ যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে শশাঙ্কবাবু স্ত্রী সুধাকে আক্ষেপ করে বলেছিলেন,মানুষের জীবনের সবথেকে বড় ট্যাজেডি হল মানুষের একটাই জীবন।এই অনিশ্চিত ক্ষনস্থায়ী জীবন দিয়ে সবকিছু করা যায় না—

"**NEETA**: And I...I said—that Baba was an ordinary man, just an average person,really... Perhaps...perhaps Baba had also started feeling the same way...thinking that he was just...perhaps that's why...

SUDHA: I never told you people this,but for nights,before he left,lying in bed...one night...he said to me (As Neeta leans forward) he said that the tragedy was that man had only one life...he lives just ones."[১৬] আর এটাই হয়তো প্রত্যেক সৃষ্টিশীল অনুভূতিপ্রবণ মানুষদের জীবনের সব থেকে বড় ট্যাজেডি। ছবিটি করতে করতেই এর কারণ ব্যাখ্যা করে পরিচালক জানিয়েছেন: "Believe it or not,the fact remains that whatever we are,big or small,there is invariably an area of mediocrity in us.The moment we are aware of it,crisis begins to deepen.Crisis deepens because there is no way we can strat again from scratch,because there is no way we can correct our own conclusions."[১৭] ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে এক সাংবাদিক প্রশ্ন করেছিলেন, ছবিটা 'কতটা আত্মজীবনীমূলক?' এর উত্তরে তিনি বলেছেন,"সেটা আমার ক্ষেত্রে যতটা সত্যি ততটা আপনার ক্ষেত্রেও। যদিও জানি এ উত্তরটা সকলের জন্যে প্রযোজ্য নয়।"[১৮] লন্ডন চলচ্চিত্র উৎসবে ছবিটি দেখানোর

সময় ডেরেক ম্যালকম 'দ্য গার্ডিয়ান'-এ দ্ব্যর্থহীন ভাষায় লিখেছেন,"Sen's portrait of the self-doubting old gentleman is fascinating, since it is clearly intended to be autobiographical, and a discourse about success and failure that is as frank and honest as anything Sen has yet put on the screen..."[১৯]

'একদিন অচানক' চলচ্চিত্রে প্রথম থেকেই আমরা এক্সপেরিমেন্টাল মৃণাল সেনকে পেয়ে যাই।প্রথম দৃশ্যেই ফ্রিজ শটের ব্যবহার ও কতকগুলি সাদা-কালো স্ন্যাপশট ও অবিরাম বৃষ্টির সাউন্ড ট্র্যাকের মাধ্যমে অসাধারণ মন্তাজের আশ্রয়ে জলমগ্ন কলকাতার চিত্র তথা পরিবেশ নির্মাণ করেছেন।এক বৃষ্টিভেজা এক সন্ধ্যায় প্রফেসর শশাঙ্কবাবু নিরুদ্দেশ হয়ে যান।তাঁকে কেন্দ্র করে পরিবারের বাকি সদস্যদের উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা, নানা টুকরো টুকরো স্মৃতি ফ্ল্যাশবাকের আশ্রয়ে অসাধারণ কোলাজের ভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন।এখানে কাহিনি বর্ণনায় প্রচলিত রীতি অনুসারে ন্যারেটিভের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা হয়নি। এই অতীত ও বর্তমানের কাহিনি বর্ণনার জন্য তিনি প্রচলিত রীতি অনুসারে বর্তমানকে থামিয়ে দিয়ে অতীতে প্রবেশ করে আবার বর্তমানের কাহিনি বর্ণনা করেননি।এডিটিং-এর সাহায্যে বর্তমানের কথা বলতে বলতেই একাধিক ফ্ল্যাশব্যাকের মাধ্যমে অতীতের চিত্র তুলে ধরেছেন অর্থাৎ অতীত ও বর্তমান হাত ধরে একইসঙ্গে চলেছে।পরিচালক বলেছেন, "একদিন অচানক-এর মূল ভাবনা এটাই।অনুসৃত পদ্ধতি অবলম্বন করে হাট করে খোলা দরজা দিয়ে বর্তমান থেকে অতীতে যথেচ্ছ আনাগোনা করতে করতে ছবিটা শেষ মুহূর্তে একটা মূল উপলব্ধিতে পৌঁছায়— মানুষের জীবনে সবচেয়ে বড়ো ট্র্যাজিডি এইটেই যে মানুষ একবারই বাঁচে।"[২০] একটা সিকোয়েন্সে দেখা যায়,স্বামী নিরুদ্দেশ হবার পরে সুধাময়ী যখন অপর্ণার নাম লিখিত কাগজের টুকরোটি দেখছে তখন হঠাৎ দরজার বেল বেজে উঠলে সে দৌড়ে দরজা খুলতে যায়।ফ্ল্যাশব্যাক শুরু হয়।সুধাময়ী দরজা খুলতেই দেখা যায় শশাঙ্কশেখরবাবু ব্যাংক থেকে পেনশন তুলে বাড়ি ফিরলেন—

"Cut to Sasank's study...Sudha slowly comes into view.She is sitting on a couch and looking at the envelope with Aparna's name written on it.There is the sudden sound of the doorbell ringing.Sudha is confused for a moment,then rushes to the bedroom and hides the envelope inside the wardrobe.In the mean time,the bell rings again.
SUDHA: coming...! I said, I'm coming...

(Flashback begins.)

Sudha opens the door.Sasank enters, shivering from the cold.

SASANK: It's freezing outside.I'd thought that it wouldn't be so cold this year..."[২১]

আবার, ফিজিক্যাল ডিটেল বা কোনও অতিরিক্ত শটের সাহায্য ছাড়াই শুধুমাত্র 'ইনফারেন্স'-এর উপর নির্ভর করে কম্পোজিশনের মাধ্যমে চরিত্রের মনস্তত্ত্বকে তুলে ধরেছেন। যার ফলে চলচ্চিত্রে অসাধারণ মুহূর্ত সৃষ্টি হয়েছে। প্রফেসর শশাঙ্কশেখরবাবু হঠাৎ চলে যাবার পর পরিবারের সদস্যেরা যখন চিন্তাক্লিষ্ট ও উদ্বিগ্ন তখন হঠাৎ-ই বাড়ির বাইরে গাড়ির অস্পষ্ট হর্ন শোনা যায়।ক্যামেরাকে একই জায়গায় স্থির রেখে পরিচালক দেখালেন চরিত্রের প্রতিক্রিয়াগুলো। বেল কে বাজাতে পারে, কে আসতে পারে,শশাঙ্কবাবু ফিরে এসেছেন কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন জাগতে শুরু করে। গাড়ির শব্দে সেই নিস্তব্ধ পরিবেশে যেন প্রাণের স্পন্দন ফিরে আসে বাড়িটিতে। তারা ছুটে বারান্দায় গিয়ে বাইরে দেখতে থাকে। লো আঙ্গেল শটে ধীরে ধীরে তাদের প্রত্যেকের উপর দিয়ে ক্যামেরা প্যান করে।ছবির মাঝে মাঝেই এই টেকনিক তথা 'ডিজাইনিং বাই

ইনফারেন্স'-এর মাধ্যমে চলচ্চিত্রে একাধিক দৃশ্যকে ফ্রেমবন্দী করেছেন।এছাড়া চরিত্রের নানা অভিব্যক্তিকে তুলে ধরতে দরজার ঘন্টা আর ফোনের যান্ত্রিক আওয়াজের ব্যবহার চলচ্চিত্রে ভিন্ন সুর বয়ে এনেছে।আসলে "গোটা ছবি জুড়েই ছেদ-যতি গুলো সরবরাহ করে এই টেলিফোন আর কলিং বেল।"[২২]

শেষ দৃশ্যে দেখা যায় পরিবারের সদস্যেরা একে অপরের কাছে নিজেদের দোষ-ত্রুটিগলো তুলে ধরছে।ফাঁকা লাইব্রেরির শূন্য ঘরে আলোর রিয়ালিস্টিক মেজাজকে ক্ষুন্ন করে একই সঙ্গে "প্যাচেস অভ ব্রাইটনেস,প্যাচেস অভ ডার্কনেস"[২৩] এর আশ্রয়ে পরিবারের চার সদস্যের শূন্যতাকে তুলে ধরেছেন পরিচালক।যার ফলে ওয়াইড শট ও প্যানের মাধ্যমে চিত্রিত এই দৃশ্যে আলোর স্বাভাবিক ব্যবহার ছাড়াই আলো-আঁধারি খেলায় "চরিত্রগুলো যেন এক একটা কনসেপ্টের আকার"[২৪] নিয়েছে।

'বীজ' উপন্যাস প্রকাশিত হবার আগে 'জনৈক নায়কের জন্মান্তর' নামক অনুল্লেখ্য উপন্যাসে 'মিশ্র তরঙ্গ' রীতির আশ্রয় নিয়েছিলেন লেখক।'খারিজ' ও পরবর্তী প্রায় সব উপন্যাসে এই রীতি অনুসৃত হয়েছে।আলোচ্য উপন্যাসে ঘটনার পরম্পরা না মেনে কাহিনি কখনও বর্তমান থেকে অতীতে আবার অতীত থেকে বর্তমানে আবার ভবিষ্যতে কী ঘটবে তা আগেই জানিয়ে দিয়েছেন। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের সেতুবন্ধন অর্থাৎ অতীতে চোখ মেলে বর্তমানে পা ফেলে ভবিষ্যতের দিকে যাত্রা করেছে কাহিনি— "বৃষ্টির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে তাঁর বুকের মধ্যে কেমন একটা উদ্বেগ অনুভব করলেন। যেন কি একটা হতে যাচ্ছে। হবে। আতঙ্ক না আনন্দ বুঝতে পারলেন না। যেন কি একটা দুর্ঘটনা ঘটতে যাচ্ছে, কিংবা প্রচন্ড কোন সুখবর।এমন এক একদিন হয়,কেন হয় বুঝতে পারেন না। কিছুই তো শেষ অবধি হয় না।আজ কি সত্যি কিছু ঘটবে?"[২৫] অর্থাৎ ঔপন্যাসিক প্রথম পরিচ্ছদেই কাহিনি কোন দিকে যেতে পারে তার আভাস দিয়ে রাখলেন।প্রচলিত সমাজ ব্যবস্থা,সিস্টেমের কাছে এক অনিমেষ সাধনা হার মেনেছিল।কিন্তু সেই নেতিবাচকতায় কাহিনি শেষ হয়নি।এক তীব্র বিশ্বাস ও প্রত্যয়ে লেখক জানিয়েছেন, সেই অনিঃশেষিত কাজ সম্পূর্ণ করতে ভবিষ্যতে কেউ না কেউ এগিয়ে আসবে। সত্যের পরাজয় হয় না ঠুনকো মিথ্যের কাছে।পরিচালক সেরকম কোন ইঙ্গিত দেন নি— মানুষের একটাই জীবন,একটা জীবন দিয়ে সব কিছু করা যায় না।তাই তীব্র যন্ত্রণায় ক্ষত-বিক্ষত হয়ে শশাঙ্কবাবু ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যান।আর ফেরেন নি।কোন আশার দ্বীপ পরিচালক জ্বালান নি। পরিচালক বলেছেন,"...the ending of the text was different.When I wrote the film,I changed the order,I had to,without disturbing the central theme."[২৬] প্রফেসর শশাঙ্কশেখরবাবু সপরিবারে কলকাতায় একটা ভাড়াবাড়ীতে থাকতেন। দারিদ্র্য, হাজার প্রতিকূলতার মাঝেও তিনি নিজের বিবেককে বিক্রি করেননি নিষ্ঠুর সময় ও সমাজের কাছে। পরিবারের স্ট্যাটাস পাগল সদস্যেরা প্রতিনিয়ত ব্যঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করলেও শশাঙ্কবাবু বিচলিত হননি। আদর্শ,সত্যের জন্য লড়াই চালিয়ে গেছেন।চলচ্চিত্রে আমরা দেখতে পাই, প্রফেসর শশাঙ্কশেখরবাবু নিজেই বাড়ির মালিক,পেনশন পান, প্রভিডেন্ট ফান্ড-এ জমানো অর্থ আছে, বাড়ি ভাড়া পান।ক্রমবর্ধমান দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির জন্য অরুণবাবু নোট বই লিখে বা কোচিং সেন্টারে পড়িয়ে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জনের কথা বললেও শশাঙ্কবাবু রাজী হননি,নিজের বোধ, আদর্শ থেকে সরে আসেননি।শশাঙ্কশেখর বাড়ি ছেড়ে চলে যাবার পর সহকর্মী অমিতেশবাবু তাঁর বই,প্রাচীন পুথি-পত্র,দামী নানা মূর্তির বিক্রির জন্য তাগাদা দিতে থাকে কিন্তু সুধাময়ী কিছুতেই রাজী হননি।পরিচালক দেখিয়েছেন,শশাঙ্কশেখরের অনুপস্থিতিতে কেউ রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারবে না এই অজুহাত দেখিয়ে সমরবাবু কলেজে লাইব্রেরিতে বইগুলো ডোনেট করেছে। এছাড়া রুমা-জীবনদার আখ্যান,অলোক-ঝুমার বিয়ের প্রসঙ্গ পরিচালক বর্জন করেছেন।জীবনদা রুমাকে অর্থের

প্রলোভন দেখিয়েছিল— সিনেমায় নামলে অনেক টাকা ঘরে আসবে।কিন্তু তার মনে যে অভিসন্ধি ছিল রুমা ধরতে পারেনি।যদিও জীবনদার কুৎসিত চেহারা ঝুমার দৃষ্টি এড়ায়নি।একসময় রুমা নিজের ভুল বুঝতে পারে।সমস্ত মেধাবী ছাত্র অর্থ উপার্জনের নেশায় ছুটে গেলেও অতনু ছেড়ে যায়নি।পরবর্তীতে অতনু ও রুমার সম্পর্কের আভাস লেখক দিয়েছেন।অলোকবাবুর সঙ্গে ঝুমার বিয়ের সানাই-এর সুরেই কাহিনি শেষ হয়েছে।চলচ্চিত্রে দেখা যায়,অলোক ঝুমাদের বাড়ির অবস্থা দেখে বিয়ের কথা তোলেনি।সে সাধ্যমতো পরিবারের পাশে থেকেছে।ভাড়াটে-মালিকের সম্পর্ক কখনো মধুর হয় না।শশাঙ্কশেখরবাবু বাড়ি ছেড়ে চলে গেলে বাড়ির মালিক যতীনবাবু প্রথমে তাদের পাশে থেকেছে।কিন্তু কিছুদিন পর তার স্বরূপ বেরিয়ে পড়ে।অমুরা ভাড়া দিতে পারবে না এই অজুহাত দেখিয়ে অন্যত্র বাড়ি খুঁজে নিতে বলে,হয়তো অন্য কাউকে ভাড়া দিলে আরও বেশি ভাড়া পাওয়া যেতে পারে।অমুর ব্যবসায়িক সাফল্যকে তিনি ভালো চোখে নেননি।বার বার বুঝিয়ে দিয়েছেন,আমি উপরে,তুমি নীচে।পরিচালক এই আখ্যানাংশ সম্পূর্ণ বর্জন করেছেন।অলোক তান্ত্রিকের ঠিকানা দিলে অমু শুনে রেগে যায়।সে বুজরুকি,কুসংস্কারকে বিশ্বাস করতো না।সুধাময়ী অমুকে না জানিয়ে সাধুবাবার কাছে যান।চলচ্চিত্রে দেখা যায়,শশাঙ্কবাবু নিরুদ্দেশ হলে প্রতিবেশী একজন মহিলা সুধাকে তান্ত্রিকের কাছে যাবার পরামর্শ দেয় এবং শশাঙ্কশেখরের প্রতি সমবেদনা ব্যক্ত করে।শশাঙ্কশেখরের প্রতি তার যে ভালবাসা তথা হৃদয়ানুভূতি প্রচ্ছন্ন ছিল,হঠাৎ এক অপ্রত্যাশিত তীব্র ধাক্কায় যেন খুলে বেরিয়ে আসে।তার ভালবাসার মানুষটি যখন সবকিছু ছেড়ে চলে গেছে তখন অন্যান্যদের মতো সে-ও নিজেকে ঠিক রাখতে পারেনি এবং নিতান্তই উপযাচক হয়ে সে নিজেই সুধার কাছে আসে।যদি সেই মানুষটার সন্ধান পাওয়া যায় বা একবার চোখে দেখা যায়।সুধাময়ী মেয়ে নীতার সঙ্গে তান্ত্রিকের ব্যাপারে পরামর্শ নেয় ও তার সঙ্গে যেতে বলেন।সে প্রথমে যেতে রাজী না হলেও পরে যায়— এই সুযোগে মা-কে বাইরে নিয়ে যেতে পারবে। উপন্যাসের শশাঙ্কশেখর, সুধাময়ী, অর্পণা, অমু চলচ্চিত্রে একই নামে আছে।অতনু চরিত্রকে বাদ দিয়েছেন পরিচালক।এছাড়া উপন্যাসের কয়েকটি চরিত্রের নামের পরিবর্তন করেছেন পরিচালক। অমিতেশবাবু, রেবতী, ঝুমা ও রুমা হয়েছে অরুণবাবু, সমর, নীতা ও সীমা।

উপরে উল্লেখিত আখ্যানাংশের পরিবর্তন ও পরিবর্জন ছাড়াও একাধিক আখ্যানাংশ সংযোজন করেছেন পরিচালক। মূল কাহিনির পরিপূরক সংযোজিত এই আখ্যানখন্ডগুলি কাহিনিতে ভিন্নতর ব্যঞ্জনা বয়ে এনেছে। শশাঙ্কশেখরের অন্তর্ধানের পর কাহিনিতে দেখা যায়, খড়কুটোকে আশ্রয় করে একসময় সুধাময়ী অলোকের পরামর্শে তান্ত্রিক সাধুবাবার শরণাপন্ন হন যদি তান্ত্রিক শশাঙ্কবাবুর খোঁজ দিতে পারে।বিজ্ঞানের পাখায় ভর করে সবকিছু এগিয়ে গেলেও সমাজের এক শ্রেণির মানুষ প্রকৃত শিক্ষার অভাবে এখনও অন্ধবিশ্বাস,কুসংস্কারের অন্ধকূপে নিমজ্জিত।পরিচালক একই ঘটনা দেখালেও বিজ্ঞান, যুক্তির আলোকে সমাজের এই কুসংস্কার,বুজরুকি ও ভন্ডামিকে তীব্র ব্যঙ্গ করেছেন।সেখানে দেখা যায়,ভিড়ের মধ্যে একজন অসুস্থ হয়ে পড়লে ডাক্তারের খোঁজ করা হয়। স্বার্থপর, হৃদয়হীন অন্তঃসারশূন্য মধ্যবিত্ত বাঙালীর মূল্যবোধহীনতার স্বরূপকে চিত্রিত করেছেন পরিচালক। নীতার অফিসের দৃশ্যে দেখা যায় অফিসের পাশে একটা বাসের অ্যাকসিডেন্ট হলে অফিসের প্রায় সকলে ছুটে গিয়ে দেখতে থাকে এবং কার দোষ,কিভাবে হয়েছে, এর আগে কোথায় কিভাবে অ্যাকসিডেন্ট হয়েছিল ইত্যাদি আলোচনায় মশগুল হয়ে যায়।শিক্ষা ব্যবস্থার অধঃপতনে দেখা যায়, এক শ্রেণির তথাকথিত সমাজের সম্মানীয় ব্যক্তিরা নীতি-নৈতিকতাকে বিসর্জন দিয়ে প্রতিনিয়ত চিন্তা করে কম সময়ে সহজ উপায়ে কিভাবে আরও বেশি অর্থ উপার্জন করা যায় এবং বাজারের চাহিদা অনুযায়ী নোট লিখে শিক্ষাকে ব্যবসায়িক পণ্যে পরিণত করে।একটা দৃশ্যে দেখা যায়

অপর্ণা ও অরুণবাবু শশাঙ্কবাবুর কাছে আসে।যে গুরত্বপূর্ণ পত্রিকায় শশাঙ্কবাবুর যে লেখা বেরিয়েছে সেটা অপর্ণাকে দেয়।এছাড়া অরুণবাবু তার কোচিং-এ পড়ানোর জন্য শশাঙ্কবাবুকে অনুরোধ করলেও রাজী হন না। শেষে তিনি কোচিং সেন্টারের জন্য নোট লিখে দিতে বলেন।নোট লেখা খুব সহজ,এখান-সেখান থেকে কপি করে দিলেই হবে।পত্রিকায় প্রকাশিত শশাঙ্কশেখরবাবুর লেখার সমালোচনা করে একজন সমালোচক তাঁর লেখায় নকলনবিশির অভিযোগ তুলে চরিত্রকে কালিমালিপ্ত করে। তাঁর আজন্মলালিত নীতি, আদর্শ, সততা নিমেষেই ধূলিসাৎ হয়ে যায়।অপ্রত্যাশিত এই আঘাত তিনি সহ্য করতে পারেন না।

বর্তমান সময় ও সমাজ আভিজাত্যের মোড়ক বজায় রাখার নেশায় বুদ হয়ে টলছে আগামীর দিকে।নিজে ধুঁকছে ও পারিপার্শ্বিক সকলকে টানছে সেই অন্ধকূপ যাত্রায় এবং যারা সেই যাত্রার পথিক হতে চায় না তাদের অসামাজিক তকমা ঠুকে নির্জন বনবাসে পাঠিয়ে দেয়। পূর্বে প্রকৃতির কোলে যে বীজ বপন করা হতো তাকে এখন কৃত্রিম উপায়ে বপন করা হয় গৃহসজ্জার সৌন্দর্য্য আহরণে।দেখনদারি তথা চটকদারিতার গ্রাসে শশাঙ্কশেখরের বন্ধ মন মুক্তির স্বাদ চেয়েছিল।কিন্তু পায়নি।প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থা, সভ্যতা, সংস্কৃতি, সিস্টেম এর বিরুদ্ধে আপোশহীন লড়াই চালিয়ে গেলেও শেষে সিস্টেমের কাছে হারতে হয়,মাথা নত করতে হয় এক আদর্শবান সাধককে।তিনি হার মানেন—কিন্তু কতকগুলো প্রশ্ন ছুড়ে দেন সমাজ তথা পাঠকের কাছে।রাংতামোড়া আভিজাত্য,মেকী সত্যের কাছে প্রকৃত সত্যের কখনও পরাজয় হয় না। 'মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ'—এই বিশ্বাসের আকাশেই তারারা খেলা করে।'বীজ' উপন্যাসের শশাঙ্কশেখর স্বপ্নের বুনন বেয়ে মৃণাল সেনের চলচ্চিত্রে জীবনতরীর ক্লান্ত নাবিক অথচ সে বিনি সুতোয় অন্বেষণের মালা গেথেছিল যাকে সময়, সমাজ ছিঁড়ে দিয়েছে।

তথ্যসূত্রঃ

1) শিলাদিত্য সেন, মৃণাল সেনের ফিল্মযাত্রা, প্রতিক্ষণ, ২০১৫, পৃঃ ১২৭
2) মৃণাল সেন, প্রলয় শূর (স.), নন্দন, ১৯৯৮, পৃঃ ৪৭

3) রাজদীপ মুখার্জি (স.), মনতাজ: ভারতীয় চলচ্চিত্রের নবতরঙ্গ (১),কাঁচরাপাড়া সংবর্তক সিনে সোসাইটি, ২০১৮,পৃঃ ৯
4) জীবনানন্দ দাশ, জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা, নাভানা, ১৯৫৪, পৃঃ ২০
5) সুকান্ত ভট্টাচার্য, সুকান্ত ভট্টাচার্যের শ্রেষ্ঠ কবিতা, বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র প্রকাশনা, ২০১২, পৃঃ ১৫
6) রমাপদ চৌধুরী, উপন্যাস সমগ্র(১), আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০, পৃঃ ৪৩৭
7) রমাপদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮৯
8) রমাপদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত,পৃঃ ২২৯
9) রমাপদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত,পৃঃ ২১৩
10) রমাপদ চৌধুরী,প্রাগুক্ত,পৃঃ ২০১
11) রমাপদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত,পৃঃ ১৯৪
12) রমাপদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত,পৃঃ ২৬৩
13) রমাপদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত,পৃঃ ২২৪
14) রমাপদ চৌধুরী, প্রাগুক্ত,পৃঃ ২১৭,২১৮
15) Mrinal Sen, Always Being Born, Stellar Publishers Pvt Ltd., 2006, P 280
16) Mrinan Sen, The Absence Trilogy-Scripts reconstructed by Biren Das Sharma & Somnath Zutshi, Seagull Books Private Limited, 1999, P 202
17) মৃণাল সেন, তৃতীয় ভুবন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১১, পৃঃ ২৩৪
18) মৃণাল সেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৪
19) মৃণাল সেন, প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৩৪
20) শিলাদিত্য সেন, মৃণাল সেনের ফিল্মযাত্রা,প্রতিক্ষণ,২০১৫,পৃঃ ৮২
21) Mrinan Sen, The Absence Trilogy-Scripts reconstructed by Biren Das Sharma & Somnath Zutshi, Seagull Books Private Limited, 1999, P 176
22) জ্যোতিপ্রকাশ মিত্র ও অন্যান্য(স.), চিত্রভাষ, নর্থ ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি, ২০১৭, পৃঃ ৯০
23) বিভাষ মুখোপাধ্যায় (স.), প্রসঙ্গ মৃণাল: বিশ্লেষণ মূল্যায়ন অন্বেষণ, চলচ্চিত্র চর্চা, ২০১৬, পৃঃ ৭৫
24) বিভাষ মুখোপাধ্যায় (স.), প্রাগুক্ত,পৃঃ ৭৫,৭৬
25) রমাপদ চৌধুরী,উপন্যাস সমগ্র(১),আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১০, পৃঃ ১৯৩
26) Mrinal Sen, Always Being Born, Stellar Publishers Pvt Ltd., 2006, P 280